দিনবদলের সনদের চার বছর

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৪ জানুয়ারি, ২০১৩)

গত ৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার তার চার বছর পূর্ণ করেছে। এ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে দাবি করেছেন যে, সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যের চেয়েও বেশি অর্জন করেছে। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো দিনবদলের সনদের আলোকে সরকারের গত চার বছরের অর্জনগুলো মূল্যায়ন করা।

দিনবদলের সনদে মোট ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে পাঁচটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের খাতগুলো হলো: **দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবিলা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা; বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ; দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন; সুশাসন প্রতিষ্ঠা**। অর্থাৎ এগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের সর্বাধিক এবং সর্বাগ্রে মনোযোগী হওয়ার কথা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ (ষষ্ঠ) অগ্রাধিকার হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। এছাড়া দিনবদলের সনদে অন্তর্ভুক্ত পদ্মাসেতু নির্মাণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নেও সরকার অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছে। সরকারের এইসব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার এবং তার বিপরীতে অর্জনগুলো নিম্নে উত্থাপন করা হলো:

অঙ্গীকার	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা
১. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বিশ্বমন্দার মোকাবেলা	
দ্রব্যমূল্যের দুঃসহ চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা। মুনাফাখোরি সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেওয়া এবং চাঁদাবাজি বন্ধ করা।	বিবিএস-এর তথ্যানুযায়ী, ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি (অর্থাৎ ১০০) ধরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যসূচক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ২২১.৬৪, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২৪০.৫৫, ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৬৭.৮৩, যা ২০১২ সালের ডিসেম্বরে মাসে এসে দাঁড়িয়েছে ৩১৭.৭৭-এ। ফলে গত চার বছরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য প্রায় ৪৩.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা যায়নি। তবে এসব তথ্য থেকে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকটতা এবং তাদের দুর্ভোগ পুরোপুরি অনুভব করা যায় না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম না কমে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্যাবের তথ্যানুযায়ী, বিআর-১১ ও বিআর-৮ এর গড় মূল্য ২০০৯-এর ২৩.২২ টাকা থেকে ২০১২তে ২৯.৮৩ টাকায় (২৯ শতাংশ বৃদ্ধি) এসে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে খোলা আটার দাম বেড়েছে ২০.৮৫ টাকা থেকে ৩৩ টাকা (৫৭.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি), সয়াবিন তেলের ৮২.৮৯ টাকা থেকে ১৩৬.০৮ টাকা (৬৪.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি), আর দেশি মসুরির দাম বেড়ে ১১১.৭৫ টাকা থেকে ১১৫.২৫ টাকা (৩.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি)। বাড়ি ভাড়ার ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি ও জ্বালানীর সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধি শহরের সাধারণ জনগণের জীবনমানে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মুনাফাখোরি সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেওয়া লক্ষ্যে গত ১৭ জুন, ২০১২ তারিখে জাতীয় সংসদে 'প্রতিযোগিতা বিল-২০১২' পাস করা হলেও দ্রব্যমূল্যের উপর এর কোন ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তবে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ এফবিবিসিসিআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব জিএম কাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মধ্যস্বত্বভোগীরা নয়, অব্যাহতভাবে চাঁদাবাজিকে দায়ী করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, পরিবহনে চাঁদাবাজিকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ সরকারেরের নির্বাচনে জয়লাভের জন্য লাঠিয়াল বাহিনী দরকার। তাই বাধ্য হয়েই এসব চাঁদাবাজিকে প্রশয় দিতে হবে (www.businesstimes24.com/?p=18684)। চাঁদাবাজির খবর প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।
জনশক্তি রপ্তানি অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	গত ১১ জানুয়ারি জাতীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, গত চার বছরে ২০ লক্ষ ৪০ হাজার জনশক্তির বিদেশে কর্ম সংস্থান হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে *ইত্তেফাকের* (১৯ জুন, ২০১২) প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের কর্মী পাঠানো হার অর্ধেকে নেমে এসেছে । উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালে সাড়ে আট লাখ ৩২ হাজার ৬০৯ জন এবং ২০০৮ সালে আট লাখ ৭৫ হাজার ৫৫ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছিল। ২০০৯ সালে বিদেশ যায় চার লাখ ৭৫ হাজার ২৭৮ জন। ২০১০ সালে এ সংখ্যা আরেক দফা কমে দাঁড়ায় তিন লাখ ৯০ হাজার ৭০২ জনে। তবে ২০১১ সালে যা বেড়ে হয় পাঁচ লাখ। ২০১২ সালে ছয় লাখ ৭ হাজার ৭৯৮ কর্মী ৮৫টি দেশে গিয়েছে (প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০১৩)। কার্যত সৌদি আরব, কুয়েতের শ্রমবাজার এখনও বন্ধ রয়েছে আমাদের জন্য। গত নভেম্বরে বাংলাদেশের বড় শ্রমবাজার আরব-আমিরাতেও জনশক্তি রপ্তানী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের জনশক্তির সবচেয়ে বড় বাজার হিসেবে পরিচিত সৌদি আরবে এখন শ্রমিকরা যাওয়ার বদলে দেশে ফিরছে বেশি। ১৯৯৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে দেড় থেকে দুই লাখ শ্রমিক সৌদি আবরে গেলেও গত সোয়া তিন বছরে সেখানে গিয়েছে মাত্র ৩৪ হাজার বাংলাদেশী, আর ফিরেছে ৫০ হাজারের বেশি (*ইত্তেফাক*, ১৯ জুন, ২০১২)। বিশ্বমন্দার প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার লক্ষে রপ্তানী খাতের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা দিলেও, বিদেশ থেকে ফেরত শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা প্রদানের কথা আমরা শুনিনি। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের বন্ধ শ্রমবাজার আবার উন্মুক্ত হয়েছে। মালয়েশিয়ায় বনায়নখাতে প্রায় ৩০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের লক্ষে প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার লোকের চাহিদাপত্র পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া সরকার। জনশক্তি রপ্তানির হার কমলেও, রেমিটেন্সের পরিমাণ বেড়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১২ অর্থবছরে আগের চার অর্থবছরের তুলনায় সাড়ে তিন গুণ বেশি হয়েছে।
২ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা	
দুর্নীতি দমন	২০১১ সালের ২৪ জানুয়ারি মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত দুদক আইনের সংশোধিত খসড়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা

অঙ্গীকার	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা
কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে কমিশনকে শক্তিশালী করা।	করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি এবং মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে বাদীর ৫ বছরের জেল ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছিল। একই সঙ্গে দুদককে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের গোপন তথ্য দুদককে প্রদান করতে বাধ্য না করার সুপারিশ করা হয়েছিল। দুদকের চেয়ারম্যান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন যে, প্রতিষ্ঠানটিকে নখ-দন্তহীন বাঘে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলছে। তবে জনমতের চাপে সরকার এ গণবিরোধী অবস্থান থেকে সরে এসেছে। তবে দুর্নীতি দমনে দুদকের কার্যকর কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। আইনে পরিবর্তন এনে দুদককে আজ্ঞাবহ করার প্রচেষ্টা থেকে সরে আসলেও, সরকার দুদকের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে বলেই অভিযোগ রয়েছে টিআইবির। (৫ ডিসেম্বর, ২০১২)(http://rusbanglanews.ru/bangladesh/1510/#.UPtrXLRfvIU)। যেমন, পদ্মাসেতু নির্মাণ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে দুদক তদন্ত করে কোন দুর্নীতি হয়নি বলে ঘোষণা দেয় (*প্রথম আলো*, ২১ জানুয়ারি ২০১২)। কিন্তু পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগে ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে, দুদক পুনরায় তদন্ত করে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পায় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৎকালীন মন্ত্রী জনাব আবুল হোসেন এবং আরেকজন সাবেক মন্ত্রীর নাম বাদ দিয়ে সেতু বিভাগের সাবেক সচিবসহ সাত জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক গঠিত একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটি দুদকের এধরনের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও, দুদকের একজন সদস্য জনাব সাহাবুদ্দিন গণমাধ্যমের সামনে তদন্ত সন্তুষ্ট বলে দাবি করে একটি ধুম্রজাল সৃষ্টি করেন। ফলে পদ্মাসেতু প্রকল্পের দুর্নীতি উদঘাটনে সরকারের আন্তরিকতা এবং দুদকের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আজ দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।
ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ প্রকাশ করা (এই অঙ্গীকার দুইবার করা হয়েছে)।	নির্বাচন পরবর্তীকালে বারবার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ছাড়া গত চার বছরে ক্ষমতাধরদের কেউই সম্পদের হিসাব দাখিল করেননি। এছাড়াও বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, তারা সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছেন. যার ফলে তারা সংশোধিত *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২ অনুযায়ী সংসদ সদস্য থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। কিছু সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অযাচিতভাবে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার গুরুতর অভিযোগও উঠেছে। সম্প্রতি রাজধানীর উত্তরায় সরকারি আবাসন প্রকল্পের সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার কাজ একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান প্রসঙ্গে সরকার দলীয় সংসদ ও রিহ্যাবের সভাপতি নসরুল হামিদের চাপের কারণে রাজউকের চেয়ারম্যান পদত্যাগ পত্র জমা দেন, যা তিনি পরে প্রত্যাহার করেন (*প্রথম আলো*, ১৫ জানুয়ারি, ২০১৩)। প্রসঙ্গত, প্রধান বিরোধী দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সম্পদের হিসাব প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও, তারাও তা রক্ষা করেনি।
রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ করা।	একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটির তদন্তের ভিত্তিতে সংসদের সাবেক স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও চীফ হুইপের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলেও সংসদের মর্যাদাহানির অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, এমন অপরাধের কারণে প্রতিবেশি ভারতসহ অন্যান্য দেশে সংসদ থেকে বহিস্কারের বহু নজির রয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে বড় ধরনের একজন দুর্নীতিবাজের শাস্তি হয়েছে বলেও আমরা শুনিনি, যদিও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বরং দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তিপ্রাপ্তরা গণহারে মুক্তি পেয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার ও আদালতের ভূমিকা নিয়েও অনেক নাগরিকের মনে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। ঘুষ প্রদান-গ্রহণের সংস্কৃতি পুরোদমেই অব্যাহত রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ব ব্যাংক দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন স্থগিত করে এবং সরকার ও দুদকের নানা টালবাহানার কারণে এ প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে শুধু সরকারেরই নয়, রাষ্ট্রেরও ভাবমূর্তি চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্থ কেলেংকারীর দায় নিয়ে রেলমন্ত্রী জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত পদত্যাগ করলেও, তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সঠিক তদন্ত ও বিচার হয়নি। বরং তাঁকে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করা হয়েছে, যা সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কোরী ইতিহাসে সর্ববৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারী হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। এব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর জনৈক উপদেষ্টার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। হলমার্ক ও ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা হলেও, অর্থ ফেরত পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। দুদকের বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত সূত্রে জানা যায় যে, হল মার্ক গ্রুপের পাশাপাশি আরো পাঁচটি প্রতিষ্ঠান একই সময়ে সোনালী ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের সাথে জড়িত ছিলো। আরো কয়েকটি ব্যাংকের ক্ষেত্রেও জালিযাতির অভিযোগ উঠেছে। এসব দুর্নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা রহস্যজনক। দীর্ঘদিন ধরে ডেসটিনি মানুষের সাঙ্গে প্রতারণা করে আসলেও, ২০১২ সালের মার্চ মাসে এ ব্যপারে সরকারের টনক নড়ে। গত ৩১ জুলাই ডেসটিনি গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল আমিন ও গ্রুপের প্রেসিডেন্ট সেনাপ্রধান হারুন-অর-রশিদসহ ২২জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করে দুদক। তবে দুদকের মামলায় ডেসটিনির শীর্ষ কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করা হলেও এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মসাত করা তিন সহস্রাধিক কোটি টাকা (*প্রথম আলো*, ২৬ *জুলাই* ২০১২) উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা নেই। বর্তমান সরকারের আমলে শেয়ারবাজার থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ এবং এব্যাপারে একটি তদন্ত হলেও, সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ক্ষমতাধররা এর সঙ্গে জড়িত বলেই তা করা হয়নি।
চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও	চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও সরকারি উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা অতীতে বারবার কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেও, দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলোর লাগামহীন বিস্তার ঘটছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লোপাটের বিরুদ্ধে এখন কোনো উচ্চবাচ্যও হয় না। গত চার বছরে সরকারি দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর (যদিও ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগকে অঙ্গ/সহযোগী সংগঠন হিসেবে অস্বীকার করা হয়) চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলদারিত্ব ইত্যাদি অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশেষ করে টেন্ডারবাজি নিয়ে ক্ষমতাসীন

অঙ্গীকার	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা
নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।	দলের মধ্যে সহিংস ঘটনা ঘটেই চলছে। এক্ষেত্রে সরকারি দলের সংসদ সদস্যরাও জড়িত হয়ে পড়েছেন। যেমন, গণপূর্ত ভবনে সম্প্রতি টেন্ডার ছিনতাইকারী ঘটনার সঙ্গে এমপি শাওনের সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে *(সকালের খবর, ??? জানুয়ারি ২০১৩)*। মূলত ছাত্রলীগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৃষ্ট সহিংসতা আজ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক হত্যাকান্ড এর জঘন্যতম উদাহরণ। বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ড জাতিকে স্তম্ভিত করেছে। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন, ২০০৯*-এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন থাকা বেআইনী হলেও, এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকাকে সাদা করার ঢালাও সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
প্রতি দফতরে নাগরিক সনদ	অনেক প্রতিষ্ঠানেই নাগরিক সনদ প্রকাশ করা হলেও, এর কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। কারণ নাগরিক সনদে উল্লেখিত সেবা দেওয়া না হলে তার প্রতিকারের কিংবা শাস্তি প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। তারপরেও বলা যায় উদ্যোগটি ভালো।
সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপকভাবে কম্পিউটারায়ন করে দুর্নীতির পথ বন্ধ করা হবে।	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলেও, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্যাপক কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না, যদিও টেন্ডার প্রক্রিয়া একটি সীমিত আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে শোনা যায়। আশার কথা যে, সরকারের A2I প্রকল্পের অধীনে দেশের সকল ইউনিয়নে ওয়েব পোর্টাল সৃষ্টি করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে হবে। তবে সম্প্রতি উইকিপিডিয়ার এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ইন্টারনেট কানেকশনের মানের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬টি দেশের মধ্যে ১৭৪তম, যা শেষের দিক থেকে তৃতীয় (www.en.m.wikipedia.org/wiki/internet_in_bangladesh)।
৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ	
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা সমাধানে একটি দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫ হাজার, ২০১৩ সালের মধ্যে ৭ হাজার মেগাওয়াটে এবং ২০২১ সালে ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে।	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ছিলো তিন হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। চাহিদা ছিল পাঁচ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। ঘাটতি ছিল এক হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। বর্তমানে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ছয় হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। আগামী গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ চাহিদা হবে আট হাজার ৩০০ মেগাওয়াট। এই চার বছরে উৎপাদন বেড়েছে মোট প্রায় সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট *(প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১২), যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সফলতা। গত চার বছরে বিদ্যুতের উৎপাদন মূল্য বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি, দাম বাড়ানো হয়েছে পাঁচবার। তবে গ্যাসের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে শীতকালে লোড শেডিং কম হলেও, গ্রীষ্মকালে তা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার ২০০৯ সালে তেলভিত্তিক রেন্টাল, কুইক রেন্টাল এবং পিকিং প্লান্ট নামের তিন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে। এসব প্রকল্পে চড়া দামে আমদানীকৃত তেল ভর্তূকির মাধ্যমে সরবরাহ করে উৎপাদন শেষে আবার চড়া দামে বিদ্যুৎ ক্রয় করার বিধান রয়েছে। এসব বিধানের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সরকারের ওপর আর্থিক চাপ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। অন্যদিকে এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ না কিনলে সরকারকে প্রতি মাসে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য ৯ থেকে ৩০ হাজার ডলার 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং চার্জ' হিসেবে প্রদান করতে হয়। এ খাতে গত বছর সরকারকে ১২টি রেন্টাল এবং ১৫টি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দুই হাজার ৬৯৭ কোটি টাকা দিতে হয়েছে, বর্তমান বছরে যা দাঁড়াবে তিন হাজার ১২২ কোটি টাকাতে। এর সঙ্গে তেলের মূল্যের ভর্তূকি যোগ করলে সরকারের ওপর আর্থিক চাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ চাপের ফলেই সরকারকে সম্প্রতি আইএমএফের কাছ থেকে ১০০ কোটি ডলার সহায়তা নিতে হয়েছে (*দি ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, ১৬ মে ২০১২)। বিশেষজ্ঞদের মতে, কুইক রেন্টাল পদ্ধতি আমাদের জ্বালানী সংকটের সঠিক ও স্থায়ী সমাধান নয়। দৈনিক *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত 'বিদ্যুতের কৃত্তিম সংকটে বাংলাদেশ' ইতিমধ্যে সরকারও স্বীকার করেছে যে রেন্টাল/কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বাবদ টাকা খরচ করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার খালি হযে গেছে। আর তাই তারা পুরোনো ১৫টি প্ল্যান্টের ২৬টি ইউনিট মেরামত করার সিদ্ধান্তে এসেছে। (*প্রথম আলো*, ৭ জুলাই, ২০১২) দেশের বিভিন্ন মহলের আপত্তি সত্ত্বেও জ্বালানী তেলের দাম গত চার বছরে পাঁচবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ৩ অক্টোবর ২০১০ *বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন* সংসদে পাশ হয়েছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ফলে সরকারি ক্রয়খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। জ্বালানী নিরাপত্তা অর্জনে সম্প্রতি বাংলাদেশ রাশিয়ার সাথে পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সারাবিশ্ব যখন নিরাপত্তাজনিত সংশয়ের কারণে পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে ক্রমাগতভাবে সরে যাচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের এ চুক্তি স্বাক্ষর নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এছাড়াও রাশিয়ান প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও ব্যাপক প্রশ্ন রয়েছে।
তেল ও নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও আহরণে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।	অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা অনুযায়ী, দেশে গ্যাসের বর্তমান চাহিদা ২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট হলেও, ২৩টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে ১৭টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ ২ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। উল্লেখ্য যে মৌলভীবাজারের রশীদপুরে ১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের এবং গত বছর বাপেক্স নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জের সুন্দলপুরে ১টি গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত করলেও, গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে তেমন কোন বড় পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানি কনোকো ফিলিপসের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রির সুযোগ রেখে গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস খননের চুক্তি করে, যা জনমনে ব্যাপক বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ অবসানের পর দেশের সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাসক্ষেত্র আরও কিছুটা বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সারাদেশে বেড়ে চলেছে গ্যাস সঙ্কট।

অঙ্গীকার	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা
কয়লানীতি প্রণয়ন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কয়লা ও খনিজ সম্পদ আহরণে গুরুত্ব দেওয়া হবে।	দেশীয় কয়লা তোলার জন্য সরকার কর্তৃক *'জাতীয় কয়লা নীতি'* প্রণয়নের ঘোষণা দেয়া হলেও, এখনও তা হয়নি। দেশে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত ৫টি খনি থেকে মোট কয়লা মজুদের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি (৩ বিলিয়ন) টন, যা অতি উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা। এই কয়লা দিয়ে ৫০ বছর ধরে ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, যদিও এমন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। সরকারের ২০১৫ নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় প্রায় ২৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, যে কয়লা প্রাথমিকভাবে আমদানি করা হবে। আমাদের দেশীয় মজুদ থেকে কয়লা উত্তোলন করে ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়।
৪ দারিদ্র্য ঘুচাও বৈষম্য রুখো	
দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি ও পলণ্টী জীবনে গতিশীলতা আনা করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা হবে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের এবং ২.৮ কোটি বেকারের সংখ্যা ২০১৩ সালে হবে যথাক্রমে ৪.৫ ও ২.৪ কোটি হবে। নতুন পিআরএসপি প্রণয়ন হবে।	একটি গবেষণায় দেখা যায়, ২০০০ সালে দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। ২০১০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশ। নিম্ দারিদ্র্য সীমারেখা ব্যবহার করে দেখা যায়, ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৪.৩ শতাংশ। ২০১০ সালে তা কমে দাড়িয়েছে ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ। তবে এ উপাত্ত নিয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ রয়েছে, যেমনি রয়েছে আমাদের জনসংখ্যার তথ্য নিয়ে। এছাড়াও বর্তমানে ব্যবহৃত এক ডলার ২৫ সেন্ট দৈনিক আয়কে দারিদ্র্য সীমারেখা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, যা একটি কৃত্তিম পরিমাপক। উপরন্তু, গত কয়েক বছরের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে কত শতাংশ নিম্নবিত্ত মানুষ যে এই কৃত্তিম দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গেছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। আর দারিদ্র্যের হার কমলেও দরিদ্রের সংখ্যা কত কমেছে সে বিষয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। স্বল্পসুদে, সহজ শর্তে ও সহজে কৃষকদের ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১০ টাকার বিনিময়ে কয়েক লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে এবং ৯২ লক্ষ বর্গাচাষীকে ডিজেল ক্রয়ে সহায়তা বাবদ ৭৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারিখাতে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কৃষি উৎপাদন বাড়লেও, কৃষকরা তাদের পণ্যের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না বলে অনেকের অভিযোগ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখাতে জিডিপি'র প্রায় দুই-শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ আইন অনুযায়ী, এ সকল কর্মসূচীর উপকারভোগী কতগুলো পুনর্নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে (যেমন, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন, স্বামী পরিত্যক্তা ইত্যাদি) প্রকাশ্য ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়ার কথা থাকলেও, অধিকাংশ মন্ত্রণালয়েই প্রজ্ঞাপন জারি করে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে, অনেকক্ষেত্রে দলীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে তা করে থাকে। ফলে এ সকল কর্মসূচীতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অপচয় বিরাজমান, যে কারণে সাধারণ জনগণ এগুলোর পূর্ণ সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। আর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচীর মাধ্যমে স্থায়ী ও টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন হবে ন্যায়পরায়ণতার চর্চা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদে সাধারণ জনগণের বঞ্চনার অবসান, যে উদ্যোগ আমাদের কোন সরকারই এ পর্যন্ত নেয়নি। ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আমাদের দেশে আকাশচুম্বী, যা আমাদেরকে এক অসম সমাজে পরিণত করেছে। নুতন পিআরএসপি প্রণয়ন করা হয়নি এবং বেকারের সংখ্যাও কমেনি। কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমাদের দেশে ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়েছে, বর্তমান সরকারের আমলেও তা অব্যাহত রয়েছে।
৫ সুশাসন প্রতিষ্ঠা	
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ শক্ত হাতে দমন করা হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।	যুদ্ধাপরাধ/মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া চলছে। জামায়াত ইসলামীর সাবেক সদস্য আবুল কালাম আযাদের ফাঁসির আদেশ হয়েছে, যদিও তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখে ধূলা দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়াও দেলওয়ার হোসেন সাঈদী, কাদের মোল্লার মামলা রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা আশা করি যে, এ বিচার দ্রুত ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে সম্পন্ন হবে, যার মাধ্যমে আমাদের জাতির ইতিহাস থেকে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান ঘটবে। জঙ্গীবাদ দমনে কঠোরতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে সরকার সফলতা প্রদর্শন করতে পারেনি। বিশেষত ছাত্রলীগের সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের ভূমিকা হতাশাজনক।
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।	কাগজে-কলমে বিচার বিভাগ স্বাধীন হলেও অনেক ক্ষেত্রে এখনও আইন মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল বিচার বিভাগ। অতীতের ন্যায় যোগ্যতা বিবেচনা না করে দলীয় অনুগতদেরকেই বিচার বিভাগে নিয়োগ প্রদানের প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা লঙ্ঘন করা হয়েছে বার বার। আপিল বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ধারা বিদ্যমান রয়েছে।
বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করা।	বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধে সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও এমন মানবতাবিরোধী ঘটনা ঘটেই চলেছে যা দেশে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রে'র তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে, ক্রসফায়ার দেশে ৯১ জন মারা গেছেন। 'অধিকারে'র তথ্যানুযায়ী, গত এক বছরে ৭০ জন বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এ নিয়ে সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ উদ্বেগ প্রকাশ এবং র‍্যাব বন্ধ করার সুপারিশ করেছে, যা নিয়ে তারা ব্যাপক

অঙ্গীকার	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা
	সমালোচনার সম্মূখীন হয়েছে। যদিও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দিপু মনি ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বৈঠকে বাংলাদেশে সব ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধের অঙ্গীকার করেছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই অঙ্গিকারের পরও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড থেমে থাকেনি।
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর, জেলহত্যা মামলার পুনর্বিচার এবং ২১ আগস্ট ঘটনার তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করা।	জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের বিচার শেষ হয়েছে এবং বিচারের রায় আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে। এখনও পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে আনা যায়নি। জেল হত্যা মামলার পুনর্বিচার শুরু হয়েছে। বহুল আলোচিত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার তদন্ত চলছে। তারেক রহমানসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার সফলতা প্রদর্শন করতে পারেনি। দলীয় বিবেচনায় অনেক অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না এবং রাজনৈতিক হয়রানী অজুহাতে চার দলীয় জোট সরকারের পদাংক অনুসরণ করে প্রায় সাত সহস্রাধিক মামলা বর্তমান সরকার প্রত্যাহার করেছে – যার মধ্যে হত্যা এবং বর্তমান সরকার আমলে দায়ের করা মামলাও রয়েছে। পক্ষান্তরে বিএনপি'র দলের মহাসচিবের বিরুদ্ধে একটি পর একটি মামলা দিয়ে হয়রানী অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্তত ২১ জন ফাঁসির আসামীর দন্ডাদেশ মওকুফ (*প্রথম আলো*, ১৪ নভেম্বর ২০১২) কোনোভাবেই আইনের শাসনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলঅ গুম হয়েছে। অতি সম্প্রতি বিকাশ নামক একজন তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীকে অতি গোপনীয়তার সাথে জেল থেকে খালাস প্রদান করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন মাননীয় সংসদ সদস্য মিথ্যা হলফনামা দিয়ে রাজউকের প্লটের জন্য দরখাস্ত করেছেন। এটি একটি দন্ডনীয় অপরাধ। একজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ্ও উঠেছে। এদের কারোর বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং ক্ষমতাধররা এখনও আইনের উর্ধ্বেই থেকে যাচ্ছেন, যা আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমনকি আমাদের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানও বলেছেন যে, দেশে এখন আইনের শাসন নেই (*মানবজমিন*, ৯ জুলাই ২০১২)।
স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগ করা।	স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হলেও শুধুমাত্র ভালো ভালো বক্তব্য রাখা ছাড়া মানবাধিকার পরিস্থিতির তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। কমিশনে জনবলের সংকট রয়েছে। কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়াও স্বচ্ছ ছিল না। এখনও ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়নি।
জাতীয় সংসদ কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।	জাতীয় সংসদ সব সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। সংসদ সদস্যদের অনেকেই সংসদীয় কাজে বিমূখ – অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছেন। আমাদের মাননীয় স্পিকারের মতে, এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আইনপ্রণয়নের জন্য বাহির থেকে লোক হায়ার করে আনতে হবে। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সৃষ্ট সংসদীয় কমিটি অনেকক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় এবং কিছু কমিটি তার এখতিয়ার বহির্ভূত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে লিপ্ত। কিছু স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কিত (যেমন, ছাত্র রাজনীতি, দলীয়করণ, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, বিশ্বজিৎ হত্যাকান্ড ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো নিরব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানদের সাঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করে তাদেরকে সরকারের সমালোচনা করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন। অতীতের ন্যায় এবারও বিরোধী দল সংসদ বর্জন করছে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথের পরিবর্তে তারা রাজপথেই সমস্যা সমাধানের পথ অবলম্বন করেছে। বলা বাহুল্য যে, রাজপথে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং তা ব্যাপক ও প্রকট আকার ধারণ করে এবং সহিংস রূপ নেয়। এমন আচরণ আমাদের নির্বাচনসর্বস্ব গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়।
নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার অব্যাহত থাকবে।	নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়নি। বরং হয়েছে তার উল্টো। যেমন, সংশোধিত *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২ সংসদে অনুমোদনের সময় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের তৃণমূল কমিটির ক্ষমতাগুলো খর্ব করা এবং 'না' ভোটের বিধান বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী আইন মানে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি তুলে দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা বলা হলেও গত নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কার প্রস্তাব সরকার আমলে নেয়নি। বরং পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে এবং সংসদের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই নির্বাচনের বিধান সংযোজন করে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনই অনিয়শ্চতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ ও বর্তমান কমিশনারদের কারো কারো নিরপেক্ষতা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে।
সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিষিদ্ধ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের	রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিষিদ্ধ করার কথা বলা হলে্ও, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে একযোগে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আদিবাসীদেরকে এখনও সাংবিধানিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

অঙ্গীকার	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা
নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা হবে।	
সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা।	একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে মাননীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী কর্তৃক একটি আইনের খসড়া সংসদে উত্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি আইনে পরিণত করার সুপারিশ করলেও, সরকারের পক্ষ থেকে এ লক্ষ্যে কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হচ্ছে না।
প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রদান ও রেমিটেন্সের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।	প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে শোনা গেলেও, এ ব্যাপারে কোনো ফলাফল দৃশ্যমান নয়। প্রবাসী মূলধনকে আকৃষ্ট করার বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।
দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা; যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত; প্রশাসনিক সংস্কার; তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা; এবং ইগভর্নেন্স চালু করা হবে।	চারদলীয় জোট সরকারের অনুসরণে প্রশাসনে চরম দলীয়করণ চলছে এবং প্রশাসনকে গণমূখী করার লক্ষ্যে সংস্কারের কথা শোনা গেলেও অদ্যাবধি কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। যোগ্যতা, জেষ্ঠ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি না দিয়ে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। ফলে প্রশাসনে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। প্রশাসন ক্রমান্বয়ে মেধাশূণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং অযোগ্য ও অদক্ষরা পুরস্কৃত হচ্ছে। অনেক আগেই তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। তবে আইনটিকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। ডিজিটাল বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ই-গভর্নেন্স চালুর উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত তথ্য আপডেটই করা হয় না।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে। তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।	আজ পর্যন্ত পুলিশ সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আগের মতোই দলীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থে এবং বিরোধীদের শায়েস্তা করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ অদ্যাবধি নেয়া হয়নি।
রংপুর নতুন বিভাগ গঠন করা হবে	রংপুরকে বিভাগ করা হয়েছে।
৬. স্থানীয় সরকার	
ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা।	ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়নের কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না। বরং সকল দলীয় ও সরকারি ক্ষমতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হলো স্থানীয় সরকার যা দূর্বল থেকে দূর্বলতর হচ্ছে। সংসদ সদস্যদেরকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টার পরামর্শগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে পরিষদের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে একটি চরম দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি মন্ত্রী পরিষদ উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে মূখ্য নির্বাহী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা এ দ্বন্দ্বকে আরো প্রকট করবে। একইসাথে উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকার তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। উপজেলা পরিষদ কার্যকর

অঙ্গীকার	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা
	করার ক্ষেত্রে এসব পদক্ষেপ পর্বতপ্রমাণ বাধা। জেলা পরিষদে দলীয়ভাবে প্রশাসক নিয়োগ এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরো অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি তথা 'চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস' পদ্ধতি উপেক্ষা এবং হাইকোর্টের *আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায় অমান্য করে স্থানীয় উন্নয়ন কাজে সংসদ সদস্যদের ব্যাপকভাবে জড়িত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে তাঁদেরকে ১৫ কোটি টাকা সমপরিমাণের উন্নয়ন প্রকল্প সুপারিশের ক্ষমতা দিয়ে দেশে 'এমপিরাজ' সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। ইউনিয়ন পরিষদকে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না। সংসদ সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় দলীয় ব্যক্তিরা অনেকক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে অকার্যকর করে ফেলেছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হলেও, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারসমূহ:

কৃষি ও পলণ্টী উন্নয়ন: সরকারের অঙ্গীকার হলো ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। একই সাথে মাছ, দুধ, ডিম, মুরগী, গবাদিপশু ও লবণ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা। বর্গা চাষীদের ঋণদান, ক্ষেমজুরদের কর্মসংস্থান, তাদেরকে পল্লী রেশনের আওতায় আনা এবং ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনও সরকারের অঙ্গীকারের অংশ। *খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে গেলেও, অন্য ক্ষেত্রগুলোতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জিত হয়নি। ধান উৎপাদন বাড়লেও কৃষকরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত।* বর্গাচাষীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা হলেও, ক্ষেতমজুরদের কর্মসংস্থান ও তাদেরকে রেশনের আওতায় আনার কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি। *ভূমি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়নি।*

পরিবেশ ও পানি সম্পদ: পরিবেশ সংরক্ষণ, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে সুরক্ষা, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ভু-উপরিস্থিত পানির যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার, নিশ্চিত করার অঙ্গীকার দিনবদলের সনদের অংশ। *বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈদেশিক সাহায্য জোগাড়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৌড়-ঝাপ অব্যাহত থাকলেও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর কোন সমন্বিত উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। পরিবেশ উন্নয়নের ব্যাপারেও তেমন কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না, বরং পাহাড় কাটা ও বন উজাড় করা অব্যাহত রয়েছে। গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহারে কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।*

শিল্প-বাণিজ্য: পুঁজি বাজারের দ্রুত বিকাশ, আইনশৃঙ্খলা, ঘুষ-দুর্নীতি, প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতামুক্ত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, জনশক্তি রপ্তানী বৃদ্ধি ও প্রবাসিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করাসহ এক্ষেত্রে আরো অনেকগুলো অঙ্গীকার করা হয়েছে। *কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাজার আজ ধ্বংসের মুখে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রশাসনিক জটিলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন কিছুই ঘটে না, এমনকি ব্যাংক স্থাপন ও টেলিভিশন চ্যানেল চালুরও অনুমতি মিলে না। জনশক্তি রপ্তানীর হার হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের রেমিট্যন্স উৎপাদনখাতে বিনিয়োগের কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি।*

শিক্ষা ও বিজ্ঞান: শিক্ষাক্ষেত্রে অঙ্গীকারগুলো হলো: নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা, ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নীট ভর্তি ১০০%, ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযুগি করা, শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়মুক্ত করা, ২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদি। *সরকারের বড় সফলতা একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন, যা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ এখনও দেখা যায় না। প্রাথমিক স্তরে ভর্তির ব্যাপারে অগ্রগতি ঘটলেও, নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার এবং মাধ্যমিক স্তরে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বড় ধরনের কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। সেশনজট অব্যাহত রয়েছে এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও দলীয় প্রভাব বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছেছে। বস্তুত, দলের ছত্র-ছায়ায় ছাত্রলীগ ব্যাপক টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজীতে লিপ্ত রয়েছে। বস্তুত, পুরো শিক্ষাঙ্গনই তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ২০১৩ সালে ২৬ হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছে সরকার।*

স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ: এক্ষেত্রে অঙ্গীকারগুলো হলো – জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির পুনর্মূল্যায়ন করা, ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, আর্সেনিক সমস্যার সমাধান করে ২০১১ সালের মধ্যে সবার জন্য সুপেয় পানি এবং ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতি বাড়িতে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা। *নতুন একটি স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিছু কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও নিয়মানুযায়ী সেগুলো চলছে না। আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে এবং সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা যাবে বলে মনে হয় না।*

নারীর ক্ষমতায়ন: *'নারী উন্নয়ন নীতি' পূনর্বহালের ঘোষণা দেয়া হলেও, তাতে সাংবিধানিক চেতনার আলোকে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়নি। জাতীয় সংসদে নারী আসন ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধির কথা থাকলেও ৪৫ থেকে মাত্র ৫টি বাড়িয়ে ৫০টি করা হয়েছে। প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীদের পদায়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সংসদে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন পাশ করা হয়েছে।*

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো: পদ্মা ও কর্ণফুলী সেতু, টানেল নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেস সড়ক নির্মাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের প্রতিশ্রুতি থাকলেও দুর্নীতির অভিযোগে ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংক ও এডিবি ঋণচুক্তি বাতিল করায় প্রকল্পটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেস সড়ক নির্মাণের প্রকল্পটি শুরু হলেও প্রতিশ্রুত সময়সীমার তুলনায় অগ্রগতি অনেক পিছিয়ে আছে। রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের তেমন সফলতা নেই। বাংলাদেশ বিমান একটি দুর্নীতিগ্রস্থ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েই গিয়েছে। বনানী উড়ালসেতু চালু হয়েছে এবং কয়েকটি উড়ালসেতু উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য-প্রবাহ: সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও গণমাধ্যম শতভাগ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে না। এই সরকারের আমলে চ্যানেল ওয়ান এর সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে এবং যমুনা টিভি অনুমোদন পায়নি। টক শো বন্ধ করারও নজির রয়েছে। সংসদে পত্রিকার এবং টিভি সংবাদের সমালোচনা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি প্রদান করা হয়েছে। *আমার দেশে*'র প্রকাশ বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও, আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে তা কার্যকর হয়নি।

সকল সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়-ভীতি-হুমকি প্রদর্শন এবং সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তা বাস্তায়নের কোন সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়নি। বরং সাগর-রুনী মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের তদন্ত সুষ্ঠু না হওয়ার বিষয়টি সাংবাদিক সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এছাড়া গণমাধ্যমের কর্মীদের ওপর পুলিশী হামলা ও এ ন্যাক্কারজনক কাজের প্রতি কতিপয় মন্ত্রীর সাফাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

পররাষ্ট্রনীতি: পররাষ্ট্রনীতিতে খুব একটা সফলতা আসেনি। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নতুন কোন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। বিপরীতে গত নভেম্বর ২০১৩ থেকে আরব আমীরাতেরও ভিসা বন্ধ হয়ে আছে। সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক প্রতিনিয়ত হত্যাকান্ড ঘটেই চলেছে।

উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের পর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, আমাদের সরকার হবে সকলের। আমরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবো না। আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা হানাহানির রাজনীতি পরিহার করতে চাই। আমরা বিরোধী দলকে সংখ্যা দিয়ে বিচার করব না। আমরা বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেব। রাজি থাকলে বিরোধী দল থেকে মন্ত্রী করার ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেন। তিনি দেশে এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি দারিদ্র্যকে 'সবচেয়ে বড় শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করেন (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি, ২০১৯।

সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আসুন, সব ভেদাভেদ ভুলে দেশের মানুষের জন্য একসঙ্গে কাজ করি। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলও রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার। বিরোধী দলের ইতিবাচক সমালোচনা, পরামর্শ এবং সংসদকে কার্যকর করতে তাদের ভূমিকা ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখব।' তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যেহেতু বিজয় অর্জন করেছি, তাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।' তিনি বলেন, বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা না হয়ে সংযত থাকতে হবে। জনসেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু সরকারের মেয়াদের সাড়ে তিন বছর পার হওয়ার পর এসকল অঙ্গীকার বহুলাংশে অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে।

এক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে। বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন তো হয়ই নি, বরং তার অবনতি ঘটেছে, যা নাগরিকদের অনককে আশাহত করেছে। প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও প্রতিহিংসাপরায়নতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচনকেই অনিশ্চিত করে ফেলেছে, যার ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে বহির্বিশ্বে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটি ব্যর্থতা হলো দুদককে শক্তিশালী করা এবং দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে। সরকার দ্রব্যমূল্যও স্থিতিশীল রাখতে এবং দল ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পারেনি জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে। আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার এবং প্রশাসনের দলীয়করণ অব্যাহত রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা চরম। সকল সরকারি কার্যক্রম যেন দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের চর্চা, পশ্চাৎমুখীতা, শ্লোগান আওড়ানো, ব্যক্তিপূজা, গোষ্ঠীপূজা, মৃতের আরাধনা, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা, সবকিছুতেই অতি দলীয়করণ ইত্যাদি যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। বিরাজমান অপশাসনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সম্প্রতি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, দেশ এখন বাজিকরদের হাতে। ভর্তিবাজি, নিয়োগবাজি, টেন্ডারবাজি, দলবাজি, মতলববাজির রকমফের দেখে মানুষ দিশেহারা। পররাষ্ট্রনীতিতে এ সরকার খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি কার্যকর হয়নি। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সরকারের ভূমিকা অস্পষ্ট। এছাড়া নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে অতীত সরকারের ব্যর্থতার কথা জনগণকে বারবার স্মরণ করানো, অর্থাৎ 'ব্লেম-গেম'-এর প্রবণতা পূর্বের মতোই বর্তমান সরকারের মধ্যেও বিদ্যমান। তাই সত্যিকারার্থেই দিনবদলের সনদ বাস্তবায়ন করতে হলে সরকার যে সকল অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মে নিজেকে লিপ্ত করেছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে এবং ব্লেম-মেমের অবসান ঘটাতে হবে।

অনেকগুলো সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্য পুরো পাঁচ বছরের মেয়াদকাল, এমনকি তার বেশি সময়ও লাগতে পারে। তবে গত চার বছরে সরকার কতগুলো প্রাথমিক কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার বা জনগণের আস্থা অর্জনকারী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারতো। যেমন, ক্ষমতাধরদের সম্পদের হিসাব প্রদান, একটি আচরণবিধি প্রণয়ন, সরকারি দলের মদদে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের চর্চার অবসান, দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে জোরদারকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সরকার এ সকল ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে, ফলে ব্যাপকভাবে জনসমর্থন, বিশেষত তরুণ ও সচেতন নাগরিকদের সমর্থন হারিয়েছে, যদিও এরাই মহাজোট সরকারকে মহাবিজয় উপহার দিয়েছিল।

সরকারের অবশ্য অনেকগুলো সফলতা রয়েছে, যার অনকেগুলোই ধারাবাহিকতার সফলতা। সবচেয়ে বড় সফলতা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় বাস্তবায়ন এবং ২১শে আগষ্টের বর্বরোচিত ঘটনার পুনঃতদন্তও সরকারের সফলতার অংশ। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক ভর্তূকি প্রদান করা হয়েছে। একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, যদিও এটির বাস্তবায়ন এখনও বাকি। জঙ্গীবাদ দমনে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে বড় সফলতা হলো সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তার বেষ্টনীর আওতায় ব্যাপকহারে খাদ্যশস্য ইত্যাদি বিতরণ, যদিও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল হতে পারে না এবং দুর্নীতির কারণে এগুলোর সুফল জনগণ পুরোপুরি পাচ্ছেনা। সরকার জ্বালানী ও বিদ্যুতের সমস্যার সমাধানে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কিছু সফলতাও অর্জিত হয়েছে। তবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষেও সরকার অত্যন্ত সচেষ্ট।

বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে অনশ্চিয়তা। সংবিধানরে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বিলুপ্তির পর থেকেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। প্রধান বিরোধী দল ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ কোন সরকার ছাড়া আগামী নির্বাচনের তাঁরা অংশগ্রহণ করবে না। আর তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তবর্তীকালীন যে নামেই হোক না কেন, একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে যথাসময়ে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে, যা আমাদেরকে চরম সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিতে পারে।